# আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে মৃত্যুচেতনা

**হোসনে আরা***

**সারসংক্ষেপ :** আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে এক বিশিষ্ট নাম। ছোটগল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি ঋদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্য জগৎ। তাঁর ছোটগল্পে মৃত্যু এক অনিবার্য উপাদান হিসেবে বারবার এসেছে। মানবজীবনে অনিবার্য মৃত্যুকে তিনি মানব অস্তিত্বের সমলগ্ন করে দেখেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে আখতারুজ্জামানের ছোটগল্পে বিধৃত মৃত্যুভাবনার বিভিন্ন প্রান্ত বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রাণিজগতের অমোঘ নিয়ম মৃত্যু। অস্তিত্ববাদী দর্শনে মৃত্যুকে অস্তিত্বের সমলগ্ন করে দেখা হয়। Being and Nothingness — সত্তা এবং শূন্যতার যে দর্শন, সেখানে শূন্যতা মৃত্যুরই প্রতিরূপক। অর্থাৎ জীবনের কথা বা অস্তিত্বের কথা যেখানে বলা হয়, মৃত্যু সেখানে উহ্য থাকলেও প্রকৃতার্থে জীবনের কথার সঙ্গেই মৃত্যু মিশে থাকে।

দর্শন ও সাহিত্য — উভয়ক্ষেত্রেই তাই জীবনরহস্যের সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। সোরেন কিয়ের্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫), কার্ল ইয়ারপার্স (১৮৮৩-১৯৭১), গ্যাব্রিয়েল মারসেল (১৮৮৯-১৯৭৫) প্রমুখ আস্তিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক এবং ফ্রিডারিখ নীটশে (১৮৪৪-১৯০০), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬), জাঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৭৫) প্রমুখ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের প্রায় সবাই মানব অস্তিত্বকে নিরূপণ বা ব্যাখ্যা করতে মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনেছেন অবধারিতভাবে। হাইডেগার মৃত্যুর মধ্যে জীবনের পরিণতির সন্ধান করেছেন, কিন্তু সার্ত্র মনে করেন, মৃত্যু আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দেয়। মৃত্যু, সার্ত্রের মতে, ব্যক্তির সম্ভাবনা নয়, মৃত্যু তার জীবনে ঘটে। মৃত্যু অপেক্ষা জীবনের মধ্যেই অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটে বলে তাঁর বিশ্বাস। সার্ত্রের বক্তব্য হল, ব্যক্তি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের কাজে পরিণত হওয়া কঠিন বলে অনিশ্চয়তা ও হতাশায় জীবন ভরা থাকে। তাঁর মতে, পৃথিবীতে ব্যক্তি সঙ্গীহীন কর্মী। তার নিজের কাজের জন্য সে দায়ী, আর কেউ নয়। তবে নিশ্চয়তা ও হতাশা যেমন তার জীবনকে ঘিরে আছে, মৃত্যুভয়ও তেমনি তার জীবনে রয়েছে (সার্ত্র, ২০০০ : ২৬)।

মানব জীবনে মৃত্যু অনিবার্য হলেও প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুকে স্মরণ করে জীবন-যাপন করা অসম্ভব। মানুষ তাই মৃত্যুকে ভুলে বাঁচে আশায়, স্বপ্নের তরী ভাসায় উজান-স্রোতে। কিন্তু কখনও কখনও অস্তিত্বসংকট এবং অতি অস্তিত্বসচেতনতা জন্ম দেয় মৃত্যুভীতি বা

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



death anxiety. সৃষ্টিশীল প্রতিভার ক্ষেত্রে এই death anxiety তাঁর সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞায় নতুন মাত্রা যোগ করে। বাংলা সাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত কথন ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। Death anxiety নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর অনুভূতির প্রকাশ করেছেন —

> মৃত্যু কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকে আমাকে তাড়িত করে। আমি প্রতিদিন উইদাউট এনি ফেইল স্বপ্ন দেখি এবং স্বপ্নে রেগুলার আমি আমার মৃত্যু দেখি। কতবার যে আমি ডেডবডি দেখেছি, ইয়ত্তা নেই। ... মৃত্যু আমাকে খুব হন্ট করে। গল্পে যে এভাবে মৃত্যু এসেছে তার কারণ হতে পারে আমার খুব নিকটজনের মৃত্যুর যে শোক বা ভয় তার জন্য ভেতর ভেতর আমি প্রিপেয়ারড হচ্ছি এ গল্পগুলো লিখে। এটাকে এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল প্রিপারেশন ফর ডেথ বলতে পারো। মৃত্যু নিয়ে লিখে আমি হয়তো মৃত্যুভয় কাটাতে চেষ্টা করছি। (শাহাদুজ্জামান, ১৯৯৭ : ১৬)

মৃত্যুর ধারণার প্রভাব আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের মধ্যেও বেশ দেখা যায়। এ যুগের প্রসিদ্ধ অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিক আলবেয়ার কাম্যুর রচনায় মৃত্যুকে জীবনের বিপরীতে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে,

> I have never seen anyone die for the ontological argument. ... I see many people die beacuse they judge that life is not worth living. (Camus, 1991 : 3-4)

জীবনের সব কিছুই অর্থহীন, অযৌক্তিক বলে তিনি মনে করেন। কারণ শেষে মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। নোবেল বিজয়ী কথাসাহিত্যিক গুন্টার গ্রাস তাঁর 'দ্য টিন ড্রাম' উপন্যাসে মৃত্যু নিয়ে ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছেন। ল্যাটিন আমেরিকার নোবেল বিজয়ী গাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর গল্পে মৃত্যুর পরাজয়ের বিপরীতে জীবনের জয়োল্লাসে মেতে ওঠেন। তেমনি সারা বিশ্বের প্রায় সাহিত্যেই মৃত্যু বহুবিধ চেতনায় প্রতীকায়িত হয়েছে।

দার্শনিক, সাহিত্যিক ছাড়াও মনোবিজ্ঞানীরা অস্তিত্ববাদ এবং মানব-অস্তিত্বে মৃত্যুর প্রভাব বা ভীতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনে করেন, জীবনের লক্ষ্য নিহিত রয়েছে মৃত্যুতে (The Goal of all life is death./ Freud, 1961 : 42)। Death instincts-কে তিনি 'Thanatos' নামে অভিহিত করে মানবজীবনে মৃত্যুভীতির কার্যকরতা ব্যাখ্যা করেছেন। Freud ছাড়াও Irvin Yalom (1931), Rollay May (1909-94) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা মনে করেন, মানব-অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে চারটি উপাদান কাজ করে মৃত্যু তাদের মধ্যে অন্যতম। Yalom বলেন —

> The reality of death is important in psychotherapy in two distinct ways : death awareness may act as a boundary situation and instigate a radical shift in life perspective; and death is a primary source of anxiety. (Richard, 2001 :198)

এই death anxiety বা মৃত্যুভীতি সচেতন বা অবচেতনে আমাদের মধ্যে প্রবলভাবেই প্রভাব ফেলে। অবচেতন মনে মৃত্যুভীতির ক্রিয়ায় মানুষ ছুটে চলে অবিরাম। অঢেল অর্থ-বিত্ত-উপার্জন, সাফল্যের শীর্ষে ওঠার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা, কোনোকিছু বিচার না করে বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেওয়া প্রকারান্তরে মানব-অস্তিত্বে মৃত্যুভীতিরই প্রতিক্রিয়া। কখনও কখনও কারও কারও মধ্যে মৃত্যুভীতির চূড়ান্ত উপস্থিতি কার্যকর থাকে। তখন স্বপ্নের মধ্যেও হানা দেয় এ ভীতি। আখতারুজ্জামানের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটি ঘটে এবং একের পর এক তাঁর গল্পে মৃত্যু বা মৃত্যুভীতিকে নিয়ে আসেন তিনি বহু মাত্রিকতায়।

আখতারুজ্জামানের গ্রন্থভুক্ত ২৩টি গল্পের মধ্যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'প্রতিশোধ', 'যোগাযোগ', 'ফেরারী', 'অসুখ-বিসুখ', 'পিতৃবিয়োগ', 'দুধভাতে উৎপাত', 'কীটনাশকের কীর্তি', 'অপঘাত', 'দোজখের ওম', 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল', 'কান্না', 'রেইনকোট' প্রভৃতি ১৩টি গল্পেই মৃত্যুর নিঃশব্দ পদচারণার ধ্বনি শোনা যায়। এ গল্পগুলোতে মৃত্যু এসেছে নানা মাত্রায় — কখনও হাইডেগারের মতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অস্তিত্বের সার্থক ও পূর্ণ পরিণতিতে ('নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'অপঘাত'), কখনও প্রিয়জনের মৃত্যু-প্রতিক্রিয়ায় বা মৃত্যু-আশঙ্কার ভীতিকে সামনে রেখে ('যোগাযোগ', 'ফেরারী', 'পিতৃবিয়োগ', 'কীটনাশকের কীর্তি', 'কান্না'), পরিণত বয়সে মৃত্যুভীতি বা মৃত্যুকে আলিঙ্গনের সদিচ্ছায় ('অসুখ-বিসুখ', 'দোজখের ওম'), আবার কখনও একের মৃত্যুতে অন্যের উদ্দীপ্ত হওয়ার তাড়নায় ('প্রতিশোধ'; 'জাল-স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল'), আবার কখনওবা চলমান সমাজের অসাম্য, অস্থিতিশীলতার পরিণতি ('দুধভাতে উৎপাত', 'কীটনাশকের কীর্তি') হিসেবে অনিবার্য মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছেন লেখক।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পের 'মনোটোনাস শহরের' 'লোনলী-লগ্নে' অপ্রকৃতিস্থ যুবক রঞ্জু যে প্রবল অস্থিরতায় ভোগে তা যেন আখতারুজ্জামানের নিজ চিত্তের অস্থিরতার প্রতিকৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, আখতারুজ্জামানের ডাকনাম মঞ্জু এবং গল্পে বর্ণিত রঞ্জুর দাদা ও বাবার পেশাগত যে বিবরণ রয়েছে, তার সঙ্গেও আখতারুজ্জামানের নিজ দাদা ও বাবার পেশাগত জীবন মিলে যায় হুবহু। স্পষ্টতই এ গল্পে ইলিয়াসের আত্মজীবনের ছায়া রয়েছে। এ সম্পর্কিত মত স্মর্তব্য —

> বাস্তবত, রঞ্জু লেখক ইলিয়াসের দ্বিতীয় সত্তা (Alter ego) (আলাউদ্দিন, ২০০৯ : ২১৬)।

আত্মগত কথনভঙ্গিতে, অনুপ্রাস ধ্বনিময়তার সুললিত গদ্যভাষায় এ গল্পের বুননে মৃত্যু রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রথিত হয়েছে। গল্পের সমাপ্তিতে বিষণ্ন, বিপন্ন রঞ্জুর মৃত্যু চিত্রিত হয়েছে প্রাকৃতিক বর্ণনার পটভূমিতে রূপকায়িত অলংকৃত ভাষায় —

> প্রবলরকম ঝড় বইতে শুরু করেছিলো। আর দ্যাখো, এমন সময় শিমুল গাছের মস্ত একটা ডাল তার সমস্ত মর্মরিত পাতা, কাকলিশূন্য নীড়, বৃষ্টির ছড়ানো ফোঁটা ও রঞ্জুর জন্যে বুকভরা বর নিয়ে ঢেউয়ের মতো শব্দ করে ভেঙে পড়লো। রঞ্জুর মনে হলো, আমার ওপর, আমার বুকের মধ্যে, কালো, অন্ধকার ও ভারী কোনো নিরাকার নিশ্বাস স্থায়ী আশ্রয় নিয়েছে। দ্যাখার জন্যে ও চোখ খুলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ভিজে শিমুল ফুলের রাশি স্তূপাকার পড়ে রয়েছে ওর চোখের ওপর। ... শুঁকবে বলে রঞ্জু জোরে নিশ্বাস নিতে চাইলো, কিন্তু ওর নিশ্বাস তখন শেষ হয়ে এসেছে, রঞ্জু সুবাস নিতে পারলো না। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ২১)



প্রকৃতির অনুভবের সান্নিধ্যে অনিবার্য মৃত্যুর এ উপস্থাপনা বাংলা-সাহিত্যে বিরল, অভূতপূর্ণ নয়; তবে অবশ্যই নান্দনিক।

অনুভূতিস্পর্শী মৃত্যুর বর্ণনা ছাড়াও এ গল্পে নামকরণ থেকে উপমা প্রয়োগ — বিচ্ছিন্ন স্মৃতিকাতরতায় বারবার এ প্রসঙ্গটি এসেছে। রঞ্জুর অসংলগ্ন ভাবনায় কাজলা দিদি ও দুর্গার উল্লেখ এসেছে একাধিকবার। বাংলা সাহিত্যে এ দুই কিশোরী দিদি পাঠককে ভারাক্রান্ত করে তাদের অকালমৃত্যুর আক্ষেপে। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কাজলা দিদি' কবিতার অকালপ্রয়াত কাজলা দিদির স্মৃতিচারণ এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র উচ্ছল কিশোরী, অপুর দিদি দুর্গার অকাল মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের পাঠককে বহুকাল ধরেই করুণ রসে সিক্ত করে রেখেছে এবং এ দুটি চরিত্র যেন অপরিণত মৃত্যুর পোস্টার হয়ে গেছে। এ দুই চরিত্রকে বাস্তবজগৎ বর্জিত রঞ্জু তার দিদি বলে তাদের স্মৃতিকাতরতায় ব্যাকুল হয়েছে এবং তার বিয়োগান্তক পরিণতি ইঙ্গিতবহ হয়েছে এদের মাধ্যমে।

> এই জায়গায় এসে কাজলা দিদির জন্যে রঞ্জুর ভারি খারাপ লাগলো। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১৪)
> ছোটো ছেটো ছায়া ফেলে দুর্গার সঙ্গে রঞ্জু রেললাইন দেখতে কতোদূরে পাড়ি দিচ্ছে। ... দেখলো অন্ধকার ও জলের মধ্যে নিশ্চিন্তপুর অতল ডুবে গিয়েছে। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১৮)

এছাড়াও নানা বর্ণনায়, উপমায় বারবারই মৃত্যুর শীতল ছায়ার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। যেমন—

১. শেলফে আলমারিতে বইগুলো সারি সারি কফিনের মতো শুয়ে রয়েছে। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১৫)
২. মৃত্যুমন্থর এই রাত্রি কেবলি সময়হীন ছড়িয়ে পড়ে। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১৬)
৩. পুরনো জামগাছটায় হাজার হাজার ভিজে পাতা উদ্বন্ধন আত্মহত্যায় অতৃপ্ত ঝুলছে। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১৯)
৪. নদীর অনিকেত জলে পাগল ঢেউয়েরা জন্ম নিচ্ছে কেবলমাত্র মরবার জন্যেই। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ২০)

মৃত্যুর এমন প্রদর্শনী কি কেবল গল্প-চরিত্র রঞ্জুর অকালমৃত্যুর ইঙ্গিতকে বহন করেছে? এ ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা কি লেখক মানসে সুপ্ত ছিল না? এ গল্পের গদ্যভাষা, বয়ন ও বর্ণনা মাধুর্যে লেখক একেবারেই স্বতন্ত্র। অবশ্য পরবর্তী গল্পগুলোতে ইলিয়াস অনেক বেশি পরিমিত, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশে অনেক বেশি সংযত। পুরনো ঢাকার লোকচরিত্রের মতো অভিভূত হওয়া বা ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়াকে তিনি অগৌরবের মনে করতেন। এ সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট —

> ঢাকাইয়াদের স্বভাবের মধ্যে ভালভাবে অভিভূত হওয়া বা ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়াটা গৌরবের না। ফলে সে কথার মধ্যে ওরকম কিছু অশ্লীল শব্দ ঢুকিয়ে তার ঐ অভিভূত ভাবটাকে nutralize করছে। এর পেছনে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা urban mentality-র একটা ব্যাপার আছে। Distorted বলতে পারো। কিন্তু অভিভূত হওয়া বা ভাবে গদগদ হওয়াটা কিন্তু ঠিক Urban ব্যাপার না, এর মধ্যে একটা rural স্বভাবের ছোঁয়া আছে। কিন্তু ঢাকাইয়াদের দীর্ঘদিনের শহুরে জীবনের Struggle-এর ফলে আবেগ প্রকাশের রূপটা বদলে গেছে। (আখতারুজ্জামান, ২০১৮ : ৩৭)

এ কারণেই সুকুমার রায় তার কাছে প্রেরণা হয়ে উঠেছে।[১] লঘুভঙ্গিতে বাস্তব জীবনের পরিহাসের মাধ্যমে রায় যেমন পাঠককে সচেতন করে তোলেন, তেমনটা ইলিয়াসের কাছেও সমান আগ্রহের ব্যাপার। তাঁর সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে ইলিয়াস বলেছেন—

> এঁর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হওয়ার চান্স তিনি নিজেই দেন না। এই স্যাঁৎসেঁতে তরল আবেগতাড়িত জাতের ভেতর তিনি জন্মালেন কি করে? (উদ্ধৃত, আলাউদ্দিন, ২০০৯ : ২১)

সুকুমার রায় সম্পর্কিত ইলিয়াসের এ বিস্ময়বোধ তাঁর নিজ সম্পর্কেও আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। ইলিয়াস যেভাবে আবেগের কোমল প্রকাশকে এড়িয়ে রুক্ষ, কর্কশ ভঙ্গিকে হাতিয়ার করে মানব-মনস্তত্ত্ব, সমাজ-কাঠামোকে শিল্প-উপাদান করেছেন বাংলা সাহিত্যে তা স্বতন্ত্র মাত্রা তৈরি করেছে।

সীমিত আবেগের এমন প্রকাশ দেখা যায় 'যোগাযোগ' গল্পের আবাল্য পুরনো ঢাকায় বেড়ে ওঠা রোকেয়ার মধ্যে। রোকেয়া অবশ্য 'খাঁটি ঢাকাইয়া' নয় — তার মা গ্রামের মেয়ে। লেখকের বর্ণনায় তার বাবা-মায়ের দ্বৈত পরিচয় উঠে এসেছে এভাবে —

> আরো অনেক আগে ঢাকার আর্মানিটোলার সোলায়মান আলী ভালো তাঁতের শাড়ি কিনবে বলে স্বরূপখালি এসে চকলোকমান গ্রামের নুরুন্নেসাকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিলো। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৫০)

তাদের সন্তান রোকেয়া আজন্ম পুরনো ঢাকায় বেড়ে উঠলেও গ্রামীণ প্রকৃতি-পরিবেশের প্রতি নাড়ির টান অনুভব করে। তবে আবেগের প্রকাশে নাগরিক বৈশিষ্ট্য ধরে রাখে পুরোমাত্রায়। বাবার সঙ্গে গ্রামে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে নিজ ছেলে সাত বছরের খোকনের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে এসেছে ঢাকায়; তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের উৎকণ্ঠা, অনুশোচনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে প্রতিমুহূর্তে, পুত্রের মৃত্যুভাবনা তাড়িত করেছে তাকে, কিন্তু অন্তরের আবেগ বিস্ফোরিত কান্নায় আত্মপ্রকাশ করেনি, "রোকয়ার স্তব্ধ কাতর মুখে কোনো পরিবর্তন নেই; তার চোখের কোণে জলের দাগ শুকিয়ে এক টুকরো মেঘের মতো দ্যাখায়" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৫৪)। বাহ্যিক অবয়বে পাথুরে দেখালেও অন্তরে স্নেহের ফল্গুধারা রোকেয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছে প্রবল মৃত্যুভীতি। যাত্রাপথের পুরো সময়টা সে হ্যালুসিনেশনে ভোগে, তার দৃশ্যপটে বারবার খোকনের কবর, তার মৃতা মা ও স্বামীর আহাজারি ভেসে ওঠে। চলন্ত ট্রেন একটার পর



একটা টেলিগ্রাফের পোস্ট পার হয়ে যায়, আর রোকেয়ার চোখের সামনের দৃশ্যাবলি পাল্টাতে থাকে, কিন্তু অম্বিষ্ট বিষয় থাকে একটিই — তার খোকনের মৃত্যু। কোনো টেলিগ্রাফ পোস্টের পাশে সে দেখতে পায় 'একটা নোতুন কবর, টাটকা শোকে উঁচু।' শুনতে পায় তার স্বামীর কণ্ঠ — 'রোকেয়া, তুমি আসছো? সুবে সাদেকের আগে খোকন যে আমাগো ছাইড়া চইলা গেলো' (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৫২)। পরের টেলিগ্রাফ পোস্টেই দেখা দেয় তিন বছর আগে মৃতজগতে চলে যাওয়া তার মাকে। মৃত মায়ের কণ্ঠে সে শুনতে পায় — "রোকেয়ারে, মারে মা, আইছস তুই? এতো দেরি করলি মা? চাইরটা ঘণ্টা আগে আইলেও তো পোলাডার মুখে পানি দিবার পারতি!" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৫২)

ট্রেন চলে, দৃশ্য বদলায় — পরবর্তী টেলিগ্রাফ পোস্টে আবারও পুত্রশোকে মুহ্যমান তার স্বামী হান্নানকে যেন দেখতে পায়, তার আহাজারি শুনতে পায়। সন্তানকে ছেড়ে মামাবাড়িতে বেড়ানো এবং তার অনুপস্থিতিতে খোকনের দুর্ঘটনা তীব্র অনুশোচনায় বিদ্ধ, বিপর্যস্ত করে তাকে এবং প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু আশঙ্কা তাকে নিয়ে যায় হ্যালুসিনেশনের জগতে। সন্তানের মৃত্যুচিন্তা মায়ের কাছে তার নিজের মৃত্যুভীতির চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর। সেই ভীতিকর চিন্তা গল্পের কেন্দ্রে ঘনীভূত হয়ে লেখকের মৃত্যুভাবনার প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে।

'ফেরারী' গল্পে এর বিপরীত চিত্রই উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। এ গল্পে মৃত্যুপথযাত্রী বাবার মৃত্যুভাবনায় ভীত বেকার তরুণ হানিফের মনোজগতের অন্তর্বয়নকে শিল্পরূপ দেয়া হয়েছে। যদিও গল্পটিতে কর্মহীন যুবমানসের অবসন্নতা, দিকহারা সময়ের ইতিবৃত্তকে ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু গল্পের কাহিনি-বয়ানের কেন্দ্রে রয়েছে বাবা ইব্রাহিম ওস্তাগরের মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত হানিফের মনস্তত্ত্ব। কাহিনির সূত্রপাত ঘটেছে হানিফের ডাক্তারের খোঁজে যাওয়ার মাধ্যমে, ডাক্তার না পেয়ে তার কণ্ঠে আক্ষেপও ধ্বনিত হয়েছে। তার অসুস্থ বাবার মৃত্যু হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে সে আক্ষেপ করেছে —

> ড্ডাক্তাররে পাইনা, ম্মউতরে ক্যামনে ঠ্যাকাই? (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৬০)

প্রশ্নবাচক এ বক্তব্য এবং তার কর্মতৎপরতায় বাবার মৃত্যুকে ঠেকানোর প্রচেষ্টাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। গল্প এগিয়েছে ইব্রাহিম ওস্তাগরের অসুস্থতাজনিত উৎকণ্ঠা ও তার অতীতের পুনরাবৃত্তির সূত্রে পুরনো ঢাকা শহরের জনজীবন ও মানচিত্রের অনুপুঙ্খ বিবরণের মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে যতবারই হানিফের মনস্তত্ত্বকে উন্মোচন করেছেন গল্পকার, ততবারই ভীত-সন্ত্রস্ত এক তরুণ হৃদয়কে প্রত্যক্ষ করে পাঠক (এ ভীতির উৎস হতে পারে বহুবিধ, কিন্তু এ গল্পের অবয়বে এ ভীতির উৎস হিসেবে পিতার মৃত্যু আশঙ্কাকেই বারবার সামনে আনা হয়েছে)। ইব্রাহিমের শেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তার জামাতা হবিবর আলী কোরান তেলাওয়াৎ করে রাত কাটতে চায় এবং বলে "রাইতটা তেলোয়াৎ করলে আব্বার রুহের উপরে আল্লাপাকের রহম হইবো!"

(আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৬৯)। আপাত এ নিরীহ দরদি বাক্যটি হানিফকে রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি করে এবং "হবিবর আলীর এই শুকনো ও কালো বাক্যে অদৃশ্য আগরবাতি ও লোবানের গন্ধে ঘরবাড়ি ম'ম' করে। হানিফ ছিটকে পড়ে বাইরে" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৬৯)।

বেকার হানিফ সমকালের স্রোতে গা ভাসাতে পারে না, মহল্লার অন্য যুবকদের মতো ছিনতাই বা রংবাজি করে অর্থ উপার্জনের মতো সাহস তার নেই, বড়ো ভাই হান্নানের মতো বৈষয়িক বুদ্ধিরও অধিকারী সে নয়। সমকাল ও স্বসমাজে একান্তই অনুপযোগী হানিফ তাই মৃত্যুপথযাত্রী বাবাকে আঁকড়ে ধরতে চায়, বাবার স্নেহ-শাসনের ছত্রছায়ায় দিনযাপনের অভিলাষই তার মধ্যে বাবার মৃত্যু আশঙ্কাজনিত ভীতিকে প্রবল করে তোলে। হানিফের এ ভীতিকে স্পর্শ করে গল্পের ইতি টানা হয়েছে ইব্রাহিম ওস্তাগরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে — যে সংবাদ অস্তিত্ব-সংকটকে তীব্রতর করে হানিফকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় গলি-উপগলিতে, রাজপথে। পুরনো ঢাকার গলি-উপগলির মধ্যে সে অস্তিত্ব-সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে থানায় পুলিশের হেফাজতে আশ্রয় বা নিরাপত্তা খোঁজার ভাবনায় আকুল হয়। বাবার মৃত্যু-পরবর্তী হানিফের প্রতিক্রিয়া লেখক নিপুণ মর্মভেদী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এভাবে —

> বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে মিলিত মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকারে ওর জমাট বাঁধা করোটিতে একটি বিস্ফোরণ ঘটলো। হৃদপিণ্ড ছিটকে পড়লো এদিক ওদিক এবং সম্পূর্ণ তছনছ হয়ে গিয়ে হানিফ তার বেঁটে শরীর থেকে প্রায় বেরিয়ে পড়লো। ... সকলের সম্মিলিত শোকধ্বনি পুলিশ সার্জেন্টের পা হয়ে সলিড একটা লাথি মারলো হানিফের পাছায়; সুতরাং হানিফের সমস্ত শরীরের রক্ত, মাংস এবং করোটির বিন্যাস বড়ো এলোমেলো হয়ে গেলো। সদ্য বিদ্যুৎমুক্ত শিথিল ও অবসন্ন আঙুলের ফাঁক দিয়ে কোরান শরীফ গড়িয়ে পড়লে তার মজ্জাহীন শুকনো হাড়গোড়ে ফাতেমার হাহাকার খটাখট প্রতিধ্বনি তোলে শূন্য হাতে বিলাপমুখরিত বাতাস কেটে কেটে হানিফ বয়ে চলে সামনের দিকে। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৭৪)

বাবাকে মৃত্যুর করাল থাবা থেকে বাঁচানোর সূত্রে হানিফ মূলত তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছে। বাবার মৃত্যুতে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে — এ ভাবনায় জারিত হানিফের হৃদয় মৃত্যুভীতিতে আক্রান্ত। আপাতদৃষ্টে এ ভীতির উৎস বাবার মৃত্যু হলেও, দশ বছর পূর্বে মাতৃহীন হানিফের ক্ষেত্রে তা তার অস্তিত্ব-সংকটের স্বরূপ নির্দেশ করে।

'পিতৃবিয়োগ' গল্পে পিতা আশরাফ আলির মৃত্যুতে পুত্র ইয়াকুব আলির মনোগহনের ভাবনা-জগৎ উন্মোচিত হয়েছে। 'ফেরারী' গল্পের হানিফের মতো ইয়াকুবের হৃদয়ে বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে ভীতি নেই, আছে বাবার মৃত্যু-পরবর্তী ভিন্নতর অস্তিত্ব-সংকট। জন্মের পর মায়ের মুখ দেখেনি ইয়াকুব, মানুষ হয়েছে সে নানির কাছে। বিগত তেইশ বছর ধরে তার মৃতদার পোস্টমাস্টার পিতা নিয়মিত মানি-অর্ডার ও চিঠি



পাঠিয়ে ছেলের পড়াশুনা ও বেড়ে ওঠা নির্বিঘ্ন করেছে; পিতা হিসেবে পুত্রের জীবনে তার ভূমিকা এটুকুই। ইয়াকুবের মামা-খালাদের ভাষায় আশরাফ আলি 'হাঁড়িমুখো পোস্টমাস্টার'; তার ভেতর একবিন্দু রসকস নেই। ইয়াকুব নিজেও বাল্যাবস্থায় বাবাকে জড়িয়ে ধরে কোলে উঠতে যেয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে — তার বাবার কাছে ছেলের এ আচরণ ন্যাকামি বলে মনে হয়েছে। কঠোর নীতিবাদী পিতার স্নেহ-মমতার স্পর্শহীন ইয়াকুব তবুও সমগ্র জীবন পিতার কঠোর নীতিপরায়ণতাকে দেখেছে শ্রদ্ধার সঙ্গে, তাকে আদর্শস্থানীয় বিবেচনায় ধ্যান করেছে। বাবার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ছোটমামাকে নিয়ে সে যখন কুষ্টিয়া জেলার আলমডাঙায় বাবাকে দেখতে গিয়েছিল, আশরাফ আলি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এ ধরনের লৌকিকতা দেখানোর জন্য এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার করেছিলেন। ফিরে এসে ইয়াকুবের ছোটমামা যখন সে রাগ ঝেড়েছিল তার মা অর্থাৎ ইয়াকুবের নানির ওপর এবং আশরাফ আলি সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেছিল, ইয়াকুব তা সাধারণভাবে মেনে নিতে পারেনি; তার ভাবনা স্ফীত হয়েছিল পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও গর্ববোধে —

> ছোটোমামার কথা শুনে রাগে ইয়াকুবের গা জ্বলে যায়, কিন্তু কাউকে চড়া করে কথা বলা তার সাধ্যের বাইরে। সুতরাং মনে মনে কেবল ফোঁসে, আমার বাবা কি তোমাদের মতো মাগী টাইপের? তোমাদের মতো নাক দিয়ে দু'ফোঁটা জল পড়লেই ফোঁৎ ফোঁৎ করে রাজ্যময় ন্যুমোনিয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়ায় না। স্যাঁতস্যাঁতে কথাবার্তা শুনতে তার বাপের ঘেন্না হয়। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১৫১)

বাবার যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল পুত্রের কাছে অসাধারণ, বাবার মৃত্যুর পর সেই সন্তান বাবাকে আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে। নিঃসঙ্গ বাবার মৃত্যুর পর বাবার কর্মস্থলে এসে ইয়াকুব জানতে পারে যে, তার বাবার মৃত্যু হয়েছে অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে। কর্মস্থলের সকলে তার বাবা আশরাফ আলিকে জানে সহৃদয়, সহানুভূতিশীল, কোমল হৃদয়ের একজন রসিক লোক হিসেবে। সাব রেজিস্ট্রারের ভাষায় — "তাঁর রসবোধ বা হাস্যরস বা রসিকতাই তাঁহার চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১৫৭)। আশরাফ আলি সম্পর্কিত এ অভিজ্ঞান বিভ্রান্ত করে পুত্র ইয়াকুবকে। সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কপালের ভাঁজ, টাইট করে আটকানো ঠোঁট এবং কঠোর আদর্শধারী পিতাকে সে খুঁজে পায় না লোকের কথার প্রতিচ্ছায়ায়। বরং পিতার মৃতদেহের অবয়বের মধ্যে সে তার পরিচিত বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায়; গল্পের শুরুতেই দীর্ঘ বর্ণনায় ইয়াকুবের মনোজাগতিক ভাবনায় তা স্পষ্টরূপ নেয় —

> সুর্মা দেওয়া চোখ, কপালের ভাঁজ খুলে যাওয়ায় ফর্সা চামড়া এখন পাথরের মতো মসৃণ। শাদা কাপড়ে লোবান ও আতরের গন্ধ। শিয়রে ও পায়ে ধুপকাটি পোড়ে, মনে হয় ধোঁয়াটাও শরীরের ভেতর থেকে আসছে। আর যা সব আগের মতোই। মাঝখান দিয়ে আঁচড়ানো ছোটো করে ছাঁটা চুলে শাদা রেখা যা ছিলো তাই আছে। ... ফ্যাকাশে ঠোঁট একটার ওপর আরেকটা টাইট করে আঁটা, চিরকাল এমনি ছিলো। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১৪৮)

মৃত পিতার অবয়বের মধ্যে পরিচিতির গন্ধ খুঁজে পেলেও লোকমুখে জীবিত পিতার আচরণগত অচেনা-মূর্তি প্রবলভাবে ইয়াকুবকে দগ্ধ করে। ফলে পিতার কুলখানির পূর্বেই অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে সে দৃশ্যপট ত্যাগ করে, তার স্নেহপ্রবণ মেজো মামার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। যে পিতাকে সে চেনে না, তার মিলাদে থাকা তার কাছে যথেষ্ট যৌক্তিক বোধ হয় না। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইয়াকুব কেবল শারীরিকভাবে তার পিতাকে হারায় না, বরং আজন্ম তার মনোজগতে লালিত প্রত্নমূর্তিও বিচূর্ণীভূত হয় তার চেনা জগতের বাইরের অচেনা পিতাকে আবিষ্কার করে। পিতার এ দ্বৈতরূপের মধ্যে প্রকৃত মানুষটিকে খুঁজে পেতে সে ব্যর্থ হয়, এখানেই তার প্রকৃত পিতৃবিয়োগ ঘটে। বলা বাহুল্য যে, এ গল্পেও মৃত্যুই কেন্দ্রাতিগ শক্তি হিসেবে প্রবলভাবে কার্যকর।

'ফেরারী' ও 'পিতৃবিয়োগ' গল্পে শিল্পিত হয়েছে মৃত্যুপথযাত্রী পিতার জন্য পুত্রের অনুভূতি বা ভীতি; আখতারুজ্জামানের 'অপঘাত' ও 'কান্না' গল্পে পাওয়া যায় পুত্রের মৃত্যুতে পিতার উদ্বেগ, ভীতি বা মর্মবেদনার শিল্পিত ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত 'অপঘাত' গল্পে এক নিদারুণ সময়কে চরম irony-তে মূর্ত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে রচিত এ গল্পটিতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বুলুর বাবা মোবারক আলির মনোজাগতিক বিশ্লেষণের সূত্রে তা বিস্তৃতি পেয়েছে। বৌডোবা খালের ওপরের ব্রিজ গ্রেনেড দিয়ে উড়িয়ে দেবার সময় পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে নিহত বুলুর মৃত্যুসংবাদ পেয়েও তার বাবা-মা সশব্দে কাঁদে না, পাছে বাড়ির ৩০০ গজ দূরের মিলিটারি ক্যাম্পে সে ক্রন্দনের আওয়াজ পৌঁছায় এবং বিপর্যয় ঘটে, পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ছেলে মরে গিয়েও তাদের বিপদে ফেলে গিয়েছে — এ ভেবে মোবারক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। বুলুর মৃত্যুকে অপঘাতে মৃত্যু বলে অভিহিত করে ব্যথিত এবং শঙ্কিত মোবারক আলির মনোজাগতিক স্তরে দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া কার্যকর থাকে। প্রথমত, মিলিটারি বিরোধী যজ্ঞে পুত্রের অংশগ্রহণে মিলিটারি কর্তৃক নিজের এবং পরিবারের অন্যদের বিপদের আশঙ্কা এবং দ্বিতীয়ত, নিজ পুত্রের আকস্মিক অপঘাতে মৃত্যুজনিত শোককে প্রকাশ করার অক্ষমতা তার মনোজাগতিক ভুবনে যে তোলপাড় তোলে তারই শিল্পভাষ্য এ গল্পটি। ঘটনাক্রমে গ্রামের চেয়ারম্যানের ছেলে শাজাহানের মৃত্যুতে বুলুর বাবা-মা তাদের অবদমিত কান্নার প্রকাশে সমর্থ হয়। বুলুর ক্লাসমেট চেয়ারম্যানের ছেলে শাজাহান জ্বরে ভুগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারে গ্রামে-গঞ্জে কোথাও ডাক্তার না থাকায় শাজাহানের সম্ভাব্য টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসা করে একজন শৌখিন হোমিও ডাক্তার। অবরুদ্ধ জনপদের সামগ্রিক অবস্থান এ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় এবং তার লাশ দাফনের সূত্রে তা স্পষ্টতর হয়। মিলিটারি ক্যাম্পের সম্মুখের সদর রাস্তা দিয়ে শবযাত্রীদের গমনের নিষেধাজ্ঞা নতুন করে সাধারণ মানুষের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয় যে, তারা পরাধীন — নিজভূমে স্বাধীনভাবে চলার অধিকারটুকু তাদের নেই। এমনকি শবযাত্রার মতো শোকাহত যাত্রাও এই অমানবিক



সেনাবাহিনীর মধ্যে বিন্দুমাত্র মানবতাবোধ জাগাতে ব্যর্থ হয়। বিকল্প পথে অর্থাৎ ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে শব নিয়ে গোরস্তানে যাবার পথে বর্ষার কর্দমাক্ত ধানক্ষেতে শবযাত্রীরা নাজেহাল হয় এবং মিলিটারির প্রতি তাদের অনাস্থা, ক্ষোভকে ভাষার মধ্য দিয়ে উদ্গিরণ করে —

> ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেম প্রায় আজান দেওয়ার মতো আওয়াজ তুলে আল্লার কাছে নালিশ করে, 'আল্লা পরওয়ারদিগার, তুমি দ্যাখো মুসলমানের মুর্দার সাথে এরা কীরকম নাফরমানি করে, মুসলমানের মুর্দার দাফন দিতেও এরা বাধা দেয়, আল্লা, এরা কাফেরেরও অধম, জানোয়ার, সব হায়ওয়ান! (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ২৮৮)

ইমাম-কণ্ঠের এ আহাজারি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার, অবিচার, জুলুম-নিপীড়ন এবং নির্মম হত্যাযজ্ঞের অমানবিকতার প্রতি চরম ঘৃণার প্রকাশ।

এ গল্পে বুলু ও শাজাহান — এ দুজনের মৃত্যুর বিপ্রতীপতায় যুদ্ধকালীন উত্তপ্ত, অবরুদ্ধ বাংলা ও বাংলার মানুষের ক্রমজায়মান মানসিকতাকে দীপ্র করা হয়েছে। মোবারক আলির মনোজগতের টানাপড়েন ও ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্তের মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে বাংলার সাধারণ মানুষের ক্রমপরিবর্ধমান মানসিকতাকে ধারণ করা হয়েছে। যে মোবারক আলি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুলুর মৃত্যুকে অপঘাত বলে অভিহিত করে এ মৃত্যু-সংবাদকে প্রাণপণে চেপে রাখে, স্ত্রীর উদ্গত কান্নাকে চেপে রাখার কঠোর নির্দেশ জারি করে; শাজাহানের মৃত্যু এবং দাফনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি বৃহত্তর গণমানুষের অসন্তোষ ও অনাস্থার ভাবাবেগে সংক্রামিত হয়ে সে মোবারক আলি জনে জনে ডেকে তার বুলুর মৃত্যুর গৌবরগাথা প্রচার করে এবং পুত্রশোকে স্ত্রী কেন কাঁদছে না — তা নিয়ে বিরক্তি জাগে তার মনে। মোবারক আলির এ মনোভাবকে লেখক প্রকাশ করেছেন গল্পের অন্তিমে তীব্র শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমায় —

> যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েকও হয়নি, সেই মা অন্য কারণে উতলা হয় কীভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে? (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ২৯২)

সমাপ্তিতে এ ভাবনার মধ্য দিয়ে অপঘাতের বদলে বুলুর মৃত্যুকে মহীয়ান করে পরিস্থিতি ভেদে মানুষের পরিবর্তনশীল মনোজগতের পট উন্মোচিত হয়েছে।

পুত্রের মৃত্যু এবং শোকাহত পিতার মনস্তত্ত্ব আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর 'কান্না' গল্পেও উপজীব্য করেছেন। এ গল্পে কেবল আফাজ আলির জোয়ান ছেলে হবিবুল্লার মৃত্যু একমাত্র উপজীব্য নয়, বরং গোরস্তানের পেশাদার জিয়ারতকারী কৃষ্ণকাঠি গ্রামের মৌলবি আফাজ আলির প্রেক্ষণ বিন্দু থেকে লেখক মৃত্যুগন্ধবাহী এক পরিবেশ উপহার দিয়েছেন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বেগবান ভাষায়। গল্পের শুরুতেই কবর জিয়ারতকারী আফাজ আলির আয়াত পড়ার বর্ণনাসূত্রে তা স্পষ্ট হয় —

আফাজ আলি পড়ে একটু ধীর লয়ে। আবৃত্তিতে তার করুণ সুর, পড়তে পড়তে ঝাপসা কান্নায় গলা ভিজে যায়, কিন্তু ভিজে শব্দের উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট। সামনে দামি ইন্ডিয়ান আগরবাতির আবছা ধূসর ধোঁয়ায় এবং হালকা মিষ্টি গন্ধে কবরের ভেতরকার লাশটির চেহারা বাইরের জ্যান্ত মানুষের জোড়া জোড়া চোখে ভাঙা-চোরা আকার পায় এবং অপরিচিত পবিত্র ভাষার রহস্যে কবরের ভিতর-বাইরের ফারাক কমতে থাকে। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৩৭৬)

কেবল কবরের ভিতর-বাইরের পার্থক্য নয়, আফাজ আলি একসময় আপন-পরের পার্থক্যও গুলিয়ে ফেলে। আই. এ. পাশ চাকরি-প্রত্যাশী পুত্র হবিবুল্লার কলেরা-জনিত আকস্মিক মৃত্যু তাকে স্বাভাবিক শোক-প্রকাশেও বিহ্বল করে তোলে। শহরের অভিজাত মানুষের দাফন করার গোরস্তানে কর্মরত মৌলবি আফাজ আলির কাছে তার পুত্রের কবর ও গোরস্তান অলীক বলে মনে হয়। ইলিয়াসের বর্ণনায় তা পাঠক মনে বিবমিষার উদ্রেক করে। আফাজ আলির দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে গ্রাম্য এ গোরস্তানের বর্ণনা এসেছে গল্পে এভাবে —

এ কী গোরস্তান না ভাগাড়? এ সব কি মুর্দাকে ইজ্জতের সঙ্গে দাফন করা, নাকি লাশ দড়ি বেঁধে টেনে এনে পুঁতে রাখা হয়েছে? খালের ভেতর বেতবন থেকে মানুষের ও বাঁশঝাড় থেকে পর্দানশিন মেয়েমানুষের গুয়ের গন্ধ, রাত্রে শেয়ালের-খোঁড়া কবরগুলোর ভেতর থেকে উঁকি-দেওয়া বয়স, লিঙ্গ ও পেশা নির্বিশেষে মুর্দাদের খুচরা-খাচরা ঠ্যাং, রান বা হাঁটুর গন্ধ এবং গিজগিজ করা গাছপালা-লতাগুলোর ভেষজ গন্ধ মিশে ফাল্গুনের ফুরফুরে হাওয়ায় অবিরাম ঘুরপাক খায়। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৩৮৭)

এ গন্ধ এবং সমুদ্রের অনিয়মিত হাওয়া আফাজ আলিকে এলোমেলো করে, নিজ পুত্রের কবর জিয়ারত করে সে যান্ত্রিকভাবে। জোয়ান উপার্জনক্ষম ছেলের মৃত্যুতে নিজের 'জীবিত অবস্থায় কবরবাস' থেকে রেহাই না পাওয়ার যন্ত্রণা, শোকের বিহ্বলতা, ছেলের চাকুরিলাভের আশায় ঘুষ দেওয়ার জন্য ঋণগ্রস্ত হওয়ার দুশ্চিন্তা সমস্ত কিছুর সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় পেশাদার কবর জিয়ারতকারী মৌলবি আফাজ আলি তার সন্তানের কবরে দোয়া পড়ে মোনাজাত তুলতে বিব্রত হয়, কেননা এ পরিস্থিতিতে খোদার দরবারে সে হাত তুলে কী চাইবে তা বুঝে উঠতে পারে না।

শবেবরাতের বিশেষ রোজগারের দিনকে সামনে রেখে, কলেরা আক্রান্ত স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে একদিন পরে আফাজ আলিকে ফিরতে হয় তার কর্মস্থল গোরস্তানে, যেখানে 'কবরের ওপর সবুজ ঘাসের গালিচায় লাল চিনা ঘাসের বর্ডার, কোনো কোনোটির মাঝখানে বা একাধারে গোলাপ, রজনীগন্ধা কিংবা ডালিয়া' (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৩৭৭)। কর্মস্থলে ফিরেই এক ফরেন অফিসার বাবার তরুণ পুত্র শাহতাব কবিরের কবরে দোয়া পড়াবার সুযোগে সে তার পুত্রের কবরে অসমাপ্ত জিয়ারতের রেশকে ফিরিয়ে আনে নিজ কণ্ঠে। জিয়ারত করে সে শাহতাবের কবরে কিন্তু অন্তরে থাকে তার কলেরা আক্রান্ড় মৃত পুত্রের শরীরী অবয়ব—



আতরের খুসবু ঐ আগরবাতি, গোলাপ ও বেলফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আফাজ আলির কণ্ঠের আয়াতগুলোকে আলগোছে ঝুলিয়ে রাখে কবরের ওপর এবং একই সঙ্গে পরম যত্নে গুঁজে গুঁজে দেয় কবরের চারপাশে। ছেলেটা ঘুমাক, মশা-মাছিতে সে যেন এতটুকু উসখুস না করে। তার কাফনে কি মাটির দাগ লেগেছে? গোসল করানোর সময় তার শরীর থেকে দাস্তর সমস্ত চিহ্ন ভালো করে মুছে ফেলা হয়েছে তো? মাটির ভেতরে শুয়ে-থাকা তার শরীরের সমস্ত নাপাক জিনিস সাফ করতে আফাজ আলি দোয়া পড়ে একটু ঝুঁকে। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৩৯০)

পুত্রের মৃত্যুজনিত বেদনাকে আফাজ আলি ধারণ করে তার পেশাগত কর্মপরিধির অন্তরালে, কিন্তু শোকের প্রাবল্য একসময় সব আবরণ ভেদ করে জায়মান হয়ে ওঠে। মোনাজাতের চোস্ত জবান ছেড়ে সে আশ্রয় নেয় গেরাইম্যা লব্জের। শাহতাবের বাবার প্রতি সহানুভূতিতে নয়, খোদার দরবারে সে দুহাত তুলে নিজের ফরিয়াদই ব্যক্ত করে—

আল্লা, তার নাদান বাপটা কি খালি গোর জিয়ারত করার জন্যেই দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকবো। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৩৭৬)

এখানেই যেন বড়ো অফিসার ধনী পিতা ও গোর-জিয়ারতকারী দরিদ্র আফাজ আলির সমীভবন ঘটে। মৃত্যু যে ধনী-গরিব সবাইকে এক কাতারে নামিয়ে দেয় – সে সত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটান লেখক এ গল্পের অন্তর্বয়নে। পেশাদার কাঁদিয়ে চরিত্র মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী' গল্পেও পাওয়া যায়, কিন্তু আফাজ আলির পেশাদারিত্বের পরিচয়ের চাইতে এ গল্পের স্তরে স্তরে মৃত্যু, লাশ, দাফন, কবরের বর্ণনা বিস্তৃতি পেয়েছে। লেখকের মৃত্যুচেতনার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে এ গল্পের বিষয়ের এমন বিস্তৃতি ঘটেছে বলা যেতে পারে।

'দুধভাতে উৎপাত' ও 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পদ্বয়ে মৃত্যু এসেছে উদ্দীপকের ভূমিকায়। প্রথমোক্ত গল্পে ওহিদুল্লার মৃত্যুপথযাত্রী মা জয়নাবের মৃত্যুযাত্রা এবং মুমূর্ষু মায়ের সন্তানদের মুখে দুধভাত তুলে দেয়ার অন্তিম ইচ্ছাকে উপজীব্য করে কাহিনির অবয়ব গড়ে উঠেছে। সংসার-উদাসী মৌলবি কসিমুদ্দিনের স্ত্রী জয়নাব ও তার পাঁচ সন্তান এ গল্পের মুখ্য চরিত্র। কসিমুদ্দিন বছরে একবার পরিবার-দর্শনে বাড়িতে আসে কোরবানির ঈদের পর কিছু মাংস নিয়ে। বাড়িতে তখন ঈদ-উৎসবের দ্বিগুণ উৎসব শুরু হয়। সারাবছর মৌলবি পরের বাড়িতে থাকে-খায়; পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন সে করে না। পাঁচটি সন্তান নিয়ে জয়নাব এক দুধেল কালো গাইকে অবলম্বন করে জীবনধারণ করে। দুধ বিক্রি করে কেনে অপ্রতুল চাল-ডাল, মাটি খুঁড়ে বের করে মেটে আলু; বনে-জঙ্গলে, মাঠে-ঘাটে থেকে সংগ্রহ করে শাক-পাতা — এভাবেই খেয়ে না খেয়ে কোনমতে বাঁচিয়ে রাখে সন্তানদের। প্রবল পেটব্যথায় বিনা চিকিৎসায় যখন সে হয় মরণাপন্ন; মনে বাসনা জাগে তার সন্তানদের মুখে দুধ-ভাত তুলে দেওয়ার; তার এ ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপ দেয়া অসাধ্য হয়ে ওঠে পরিজনদের পক্ষে। কেননা নিরন্ন এ জনপদে গরুর দুধ, বাঘের দুধের মতোই দুর্লভ। আধ মণ চালের দাম শোধ না করতে পারায় তাদের একমাত্র সম্পদ দুধেল কালো গাই নিয়ে যায় ঋণদাতা হারুন মৃধা তার নিজ বাড়িতে। মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের শেষ ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে জয়নাবের বড়ছেলে ওহিদুল্লা মৃধাবাড়িতে যায় একঘটি দুধের আশায়; যে গাই

তাদের নিজেদের, দেনার দায়ে যা মৃধার কাছে গচ্ছিত রয়েছে, সে গাইয়ের একঘটি দুধ তার মুমূর্ষু মায়ের জন্য পায় না সে; পরিবর্তে জোটে তিরস্কার, গরিব হয়ে দুধ খাওয়ার বায়নাকে পরিহাস করে মৃধাবাড়ির গৃহিণী। অগত্যা ওহিদুল্লার চাচি হামিদা বিবি চালের গুড়ি জ্বাল দিয়ে জয়নাবের সামনে দেয় এবং তার অবসন্ন হাত দিয়ে তার সন্তানদের মুখে তুলে দেয়ার প্রয়াস পায়। তার কিছু অংশ জয়নাবের গোঙানিরত মুখে তুলে দেয়ায় জয়নাব তা বমি করে উগরে দেয়, দুধভাতের স্বাদ সে জানে বলে সে অসামঞ্জস্যটা ধরতে পারে এবং হামিদার কাছে প্রশ্ন রাখে, 'বুবু, পোলাপানরে তুমি কী খাওয়াইলা?' (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১৯৪); জবাবে হামিদাও বলতে দ্বিধা করে না, — 'ক্যান বৌ? চাইলের গুড়ি পোলাপানেরে কুনোদিন খাওয়াস নাই? দুধ দিছস কয়দিন? দুধের স্বাদ তর পোলাপানে জানে কি?' (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১৯৪)। বস্তুত অভাবের নগ্ন উন্মোচনের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে গল্পের সমগ্র শরীর জুড়েই। অন্তিমে কেবল ধ্বনিত হয়েছে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের বিদ্রোহী প্রচেষ্টা। দেনার দায়ে আটক দুধেল গাইকে ছাড়িয়ে আনার জন্য অন্তিম পথযাত্রী মায়ের তিরস্কারমিশ্রিত আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে ওহিদুল্লা সজাগ হয়; মৃত মায়ের নির্ভার কঠিন চেহারা তার হুকুম তামিলের জন্য ওহিদুল্লাকে উদ্বুদ্ধ করে। ওহিদুল্লার বিদ্রোহী চেতনায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে গল্পের।

এ গল্পে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর সমলগ্ন হয়ে জয়নাবের প্রার্থিত 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' দারুণভাবে প্রতীকায়িত করেছে নিরন্ন গ্রামীণ মানুষের রূঢ় বাস্তবতাকে। পাশাপাশি তার মৃত্যু তার সন্তানদের মধ্যে নবচেতনার জাগরণ ঘটিয়েছে। এ গল্পে তাই উদ্দীপকের ভূমিকায় মৃত্যুর অবস্থানকে নিশ্চিত করা যায়।

একই বার্তা পাওয়া যায় 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পেও। এ গল্পে কীটনাশক পানে বোনের অপমৃত্যুতে কিশোর রমিজের মধ্যে যে শোকের সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় সে তার বোনের বয়সী উচ্ছল তরুণী বড়সাহেবের মেয়ের মুখে কীটনাশক গুঁজে দিয়ে সমতা বিধান করতে চায়। এ গল্পেও রমিজের বোন অসিমুন্নেছার মৃত্যু উদ্দীপকের ভূমিকায় কার্যকর। রমিজ আলি অসাম্যের বিভেদ তুলে দিয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করে এবং সে লক্ষ্যে ধাবিত হয়।

'অসুখ-বিসুখ' ও 'দোজখের ওম' গল্পদ্বয়ে দুজন বয়স্ক জরাগ্রস্ত মানুষের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষার মনস্তত্ত্বকে শৈল্পিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। 'অসুখ-বিসুখ' গল্পে বৃদ্ধা আতমন্নেসার মনস্তাত্ত্বিক অভিযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। সাত কিংবা আট সন্তানের জননী বৃদ্ধা আতমন্নেসা তার সমগ্র জীবনে কখনও সেবা-যত্ন, শুশ্রূষা পায়নি। যৌথ পরিবারে হাঁপানি-রোগগ্রস্ত স্বামীর সেবা করে দিন কেটেছে তার; কখনও জ্বর কিংবা অসুস্থতা অনুভব করলেও কাজের ও পরিস্থিতির চাপে তা আর প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ হওয়ার দাবি করলেও তাতে কান না দিয়ে তার ছেলেমেয়েরাও নিশ্চিতভাবেই বলতে পারে : 'আম্মার বিমারি তার মনে, তার শরীল মাশাআল্লা বহুত ভালো' (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ১২৪)। বৃদ্ধা তার নিজ শরীরের বিসঙ্গতি ঠিকই টের পায়, তাই চুরি করে নিজ মেয়ের ওষুধ খায়। অতিমাত্রায় ওষুধ



খাওয়ার ফলে অচেতন হয়ে পড়লে বাড়িতে ডাক্তার আসে এবং তার পরামর্শে মেডিকেলে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আতমন্নেসার পেটে কেবল টিউমার নয়, অনিরাময়যোগ্য ক্যান্সার হয়েছে। এবার ওষুধপত্রের সঙ্গে সঙ্গে সেবাযত্নেরও কমতি থাকে না। আর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও প্রার্থিত মনোযোগ ও শুশ্রূষা পেয়ে বৃদ্ধা শারীরিক যন্ত্রণাকে পাশ কাটিয়ে অদ্ভুত এক আত্মতৃপ্তিতে মগ্ন হয়ে থাকে।

'অসুখ-বিসুখ' গল্পে আতমন্নেসার নিশ্চিত মৃত্যু তার মধ্যে কোনো ভীতি জাগ্রত করতে পারেনি। মৃত্যু যে সবার জন্য অপ্রতিহত নিয়তি — সে সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে আতমন্নেসা মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ না চেয়ে পার্থিব জীবনে ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি চেয়েছে। ওষুধের প্রতি তার অস্বাভাবিক আকর্ষণের যে বিকার তার মধ্যে দেখা যায়; তার লক্ষ্য নীরোগ হওয়া বা দীর্ঘজীবন পাওয়া নয়, বরং 'ওষুধ' এখানে তার প্রতি পুত্র-কন্যার মনোযোগের উপাদান হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে।

এ গল্পে আতমন্নেসাকে 'সমাজদেহের' সঙ্গে তুলনা করে স্থবির-জরাগ্রস্ত জড়ভরত সমাজের প্রতিকল্প হিসেবে তাকে উপস্থাপন করা হয়।[২] এ বিবেচনাকে সঙ্গে নিয়েও বলা যায়, ব্যক্তি কিংবা সমাজ — উভয়ই মৃত্যুকে সামনে রেখে রোগগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় শুশ্রূষা কামনা করে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যু অবধারিত হলেও জীবনের স্বাদ সে গ্রহণ করতে চায়, ব্যক্তি হিসেবে গুরুত্ব পেতে অভিলাষী হয়। আর সমাজও চায় টিকে থাকতে — তাই দাওয়াই বা ওষুধের খোঁজে ব্যাকুল হয় সে।

'দোজখের ওম' গল্পেও বৃদ্ধ অথর্ব শয্যাশায়ী কামালউদ্দিনের মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষার প্রহরকে ভাষারূপ দেয়া হয়েছে। পাঁচ বছর ধরে পাশ ফিরে শুতে না পারা কামালউদ্দিনের সুস্থ হয়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা ভবিষ্যৎ দৃশ্যপটে ক্রিয়াশীল নয়। তার বিচরণ তাই অতীতের ক্ষেত্রভূমিতে। ফেলে আসা জীবন, মৃত্যুর শীতলতায় হারিয়ে যাওয়া আপনজনদের সরব উপস্থিতি অনুভব করে সে তার চতুর্পার্শ্বে। বেঁচে থেকেও দোজখের যন্ত্রণা অনুভব করার কাহিনিই বয়ান করা হয়েছে মুখ্যরূপে এ গল্পে, তা অবশ্য নয়; বরং জীবনের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হওয়ার এক নীরব আহ্বান শেষপর্যন্ত গল্পের শরীরে প্রবেশ করাতে সক্ষম হন লেখক। সমালোচকের ভাষায় —

> কার্যত ইলিয়াস তাঁর মৃত্যু-পটভূমির বাইরে অন্য এক পটভূমি গড়বেন বলেই কিংবা লেখক হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলেই মৃত্যু-মৃত্যু খেলা চুকিয়ে জীবনের নতুন ওম খুঁজতে-খুঁজতে দোজখবাসী হতেও আপত্তি করেন না শেষমেশ। (মামুন, ২০১৬ : ১৫১)

কামালউদ্দিনের মন ঘুরে বেড়ায় পুরনো ঢাকার অলিগলিতে নিষ্ফলভাবে এবং শরীর পড়ে থাকে নিশ্চলভাবে বদ্ধ ঘরের আবদ্ধ বিছানায়। খোদার কাছে তার প্রার্থনা একটিই — 'আল্লা তাকে এক্ষুণি দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিক' (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৩০৯)। 'ব্যাকুলভাবে সে অনুসন্ধান চালাচ্ছে, কবে, কীভাবে সে কী গুণা করলো যে আল্লা তাকে এভাবে দোজখ খাটায়' (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৩০৯)।

কামালউদ্দিনের মৃত্যু-প্রতীক্ষার অবসান আর হয় না। তার বড় ছেলে আকবরের মৃত্যুতে আকবরের পিতৃহীন ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে সে বরং নতুন করে বেঁচে থাকার তাড়না অনুভব করে। যে ছেলেকে একসময় বাড়িতে ঢুকতে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি, সে ছেলের সন্তানাদিকে বাড়ির অধিকার দেবার লক্ষ্যে পৌত্রী পারভীনকে সাহস যুগিয়ে সে একটি লালা-বলকানো হুঙ্কার ছাড়ে, "তর চাচারে কইস, দাদায় অহন তরি বাঁইচা আছে" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৩১৮)। এবং হানিফের মায়ের বিস্ময়ভরা 'তুমি অহন তরি বাঁইচা আছো?' প্রশ্নের উত্তরে সে নিজ অস্তিত্বের বিদ্যমানতাকে প্রতিষ্ঠিত করে সজোরে উত্তর দেয়, 'বাঁচুম না ক্যালায়?' (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৩১৮)। বেঁচে থাকার এ অনবদ্য ঘোষণার মধ্য দিয়েই তার মৃত্যু-প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যটি স্মর্তব্য —

> ইলিয়াস মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির সংকট এবং তার ভেতর দিয়ে সমাজের বহু বিস্তারি স্থবির অবস্থার কি তার বিরুদ্ধে প্রেরণার চোখা দিকগুলো তুলে ধরেন। (এজাজ, ২০১৬ : ১৬৩)

বেঁচে থাকার প্রেরণা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে বেঁচে থাকতে; অমোঘ মৃত্যুর হিমশীতলতাকে উপেক্ষা করে শক্তি-সাহস যোগায় পরিবার-পরিজন এবং তাদের জন্য নিজের উপস্থিতির অপরিহার্যতার ভাবনায়। মানবজীবনের এ মৌল সত্যকে নতুন করে পাঠককে ইলিয়াস যেন মনে করিয়ে দেন আলোচ্য এ গল্পের কথকতায়।

ব্যক্তিগত জীবনের মৃত্যুভীতিই ইলিয়াসের গল্পে বিভিন্ন রূপে বিচ্ছুরিত হয়েছে, সাহিত্যে প্রচলিত মৃত্যুচেতনার বিপরীতে না গিয়েও তিনি তাঁর গল্পে যোগ করেছেন মৃত্যু চেতনার নতুন মাত্রা। মৃত্যুভীতিতে প্রবলভাবে আক্রান্ত হলেও তিনি প্রায় সব গল্পে মৃত্যুর উপর জীবনের অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন। তাই তাঁর গল্পে মৃত্যুর আখ্যান শেষ পর্যন্ত হতাশাকে সামনে নিয়ে আসে না, বরং মানবীয় অস্তিত্ব-সংকটকে তীব্র করে পাঠককে অস্তিত্বসচেতন করে তোলে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে তাঁর মৃত্যুচেতনাকে তাঁর অস্তিত্বচেতনার প্রতিরূপক বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

## টীকা

১. এক সাক্ষাৎকারে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর জীবনে সুকুমার রায়ের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন, "একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আমি সুকুমার রায় পড়ে আসছি। আমার ৮ বছর বয়সের জন্মদিনে আমার বাবা আমাকে 'আবোল-তাবোল' দিয়েছিলেন, ওই দিনই আমার ভাই শহীদুজ্জামানকে দেন 'খাই খাই'। এই দুটো বই-ই আমার দারুণ ভালো লাগে, দু-তিন বছরের মধ্যেই তাঁর আর বইগুলো পেয়ে যাই। ওই তখন থেকে সুকুমার রায় আমার জন্যও ক্লান্তিকর মনে হয়নি। গত চল্লিশ বছর ধরে সুকুমার রায় আমাকে সমানভাবে নাড়া দিয়ে আসছেন। এই কবি কখনো মুগ্ধ করেন না, হাসতে হাসতে সচেতন করে তোলেন।" সাক্ষাৎকারের এ অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে আলাউদ্দিন মণ্ডলের *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে* গ্রন্থের (ঢাকা, ২০০৯) ২০-২১ পৃষ্ঠা থেকে।

২. "মাথা ঘুরান দেওয়া অসুখ-বিসুখ গল্পটি আতমন্নেসার নাকি অসুস্থ রোগগ্রস্ত সমাজদেহের ছটফট করা ও ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতার সচিত্র বয়ান।" (এজাজ, ২০১৬ : ১৬৭)



## গ্রন্থপঞ্জি


আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ১৯৯৯। *রচনাসমগ্র-১*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আলাউদ্দিন মণ্ডল, ২০০৯। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আলেয়া বেগম, ১৯৯৭। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

এজাজ ইউসুফী (সম্পাদিত), ২০১৬। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিরিক বিশেষ সংখ্যা*, বাতিঘর, চট্টগ্রাম।

জাফর আহমদ রাশেদ, ২০১২। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

জাঁ-পল সার্ত্র (ভাষান্তর : মৃণালকান্তি ভদ্র), ২০০০। *সত্তা ও শূন্যতা*, বিজ্ঞাপনপর্ব, কলকাতা।

মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পাদিত), ২০০০। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : ফিরে দেখা সারাজীবন; ১ম খণ্ড*, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা।

শহীদ ইকবাল, ১৯৯৯। *কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশ, ঢাকা।

সমীরণ মজুমদার (সম্পাদিত), ১৯৯৭। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারক গ্রন্থ*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর।

স্বপনরঞ্জন হালদার (সম্পাদিত), ২০১৮। *বাঘের বাচ্চা*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ।

Albert Camus, 1991. *The Myth of Sisyphus and Other Essays*, Vintage Books, New York. (Translated by Justin O'Brien)

Martin Heidegger, 1996. *Being and Time*, State University of New York. (Translated by Joan Stambaugh)

Sigmund Freud, 1961. *Beyond The Pleasure Principle*, Revised Edition, W.W. Norton and Company, New York. (Translated and Edited by James Strachy)

Lois Tyson, 2006. *Critical theory today*, Second Edition, Routledge, New York. London.

Richard Nelson-jones, 2001. *Theory and Practice of Counselling & Therapy*, 3rd Edition, Continuum, London and New York.


## পত্রিকা


এবং মুশায়েরা (সম্পা. সুবল সামন্ত), ২০০৮। পঞ্চদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, '*আলব্যের কাম্যু বিশেষ সংখ্যা*', কলকাতা।


## প্রবন্ধপঞ্জি


এজাজ ইউসুফী, ২০১৬। 'চন্দ্রালোকের হন্তারক, মানবিকবোধের যুগলবন্দি', *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিরিক বিশেষ সংখ্যা*, বাতিঘর, চট্টগ্রাম।

মামুন হুসাইন, ২০১৬। 'ইলিয়াস বিষয়ে আত্মজৈবনিক,' *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিরিক বিশেষ সংখ্যা*, বাতিঘর, চট্টগ্রাম।

মৌলিনাথ বিশ্বাস, ২০১৮। 'পিতৃবিয়োগ' : 'অপরিচিত'-র স্থানাঙ্কসন্ধান', *বাঘের বাচ্চা*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ।

শাহাদুজ্জামান, ১৯৯৭। 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : ব্যক্তিগত কোলাজ' *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারক গ্রন্থ*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর।

সৃজিতা সান্যাল, ২০১৮। 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দুটি মৃত্যু : 'অপঘাত' থেকে 'উজ্জীবন', *বাঘের বাচ্চা*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ।